BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120022

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও মননদর্শন : একবিংশ শতকের আলোকে

পিপাসা কুণ্ডু

Assistant Teacher, Email: pipasakundu08@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

বাঙ্গালীদের কাছে অক্ষয় কুমারদত্ত কার্যত বিস্তৃত কেন? বাঙালি বিস্মরণ প্রবন জাতি একথা বলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বহুধা বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি, তার দুঃসাহসী বহুমুখী সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও বাস্তব কর্মকাণ্ডকে নেহাত কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না বলেই আমরা বাঙালি ভদ্রলোকেরা তার নামটি মনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর অক্ষয়কুমারের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। তার কাজের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। বিজ্ঞান প্রচারক রূপে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক রূপে, দর্শনের নব ব্যাখ্যাকার ও ইতিহাসকার রূপে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষক রূপে, শিক্ষিত বাঙালি মানুষের বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান চেতনা জাগানোর মধ্যে তার কর্মকাণ্ড সীমায়িত ছিল। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিশীলতাকে ন্যায্য গুরুত্ব দেওয়ার দরুন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতপার্থক্য হয়, ছাড়তে হয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক পদ। মস্তিষ্ক চর্চা ছাড়া উপার্জনের আর কোন পথ তার জানা ছিল না। সেই পথ ধরেই সারা জীবন চলেছিলেন। প্রথম জীবনের আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠেছিলেন শুধু বই লিখে। দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যে অসীম ধৈর্যে অকল্পনীয় পরিশ্রমে যে অমূল্য ফসল তিনি ফলিয়ে গেলেন তা থেকে পুণ্য অর্জন করার কোন দায় আমরা পরবর্তী কালে অনুভব করিনি। তারই পরিণতি আজকের এই বিস্মৃতি। যে সাহসের সঙ্গে তিনি মূল স্রোতের বিরোধিতা করে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে অনুসন্ধান বৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সেই মুক্তমন সাহসিকতার জন্যই আর তিনি আমাদের কাছে নতুন করে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। আপ্ত বাক্যের পায়ে চিন্তাহীন আত্মসমর্পণ নয়- 'সুনির্মল' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শাসিত বাস্তবমুখী জীবনচর্চায় উদ্বুদ্ধ করাই অক্ষয়কুমার দত্তের সবচেয়ে বড় অবদান।

শব্দসূচক: যুক্তিবাদী, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিজ্ঞানমনস্ক, বিদ্যাসাগার, দেবেন্দ্রনাথ।*

মূল আলোচনা:

'চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি -

কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালিদের কাছে অক্ষয়কুমার দত্ত কার্যত বিস্মৃত কেন? বাঙালি বিস্মরণপ্রবণ জাতি, একথা বলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কেন না, আমাদের বিস্মরণের একটা প্যার্টান আছে। আমরা সব কিছু ভুলি না, কিছু কিছু ভুলি। শ্রীরামকৃষ্ণ আর অক্ষয়কুমার

দত্ত একই বছর প্রয়াত হন (১৮৮৬ খ্রি:)। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যস্মরণীয়, আর অক্ষয়কুমার দত্ত বিস্মৃতি কবলিত। কেন? এমনকি দার্শনিক চিন্তার জগতে বিদ্যাসাগরও কি বিস্মৃতিই নন? শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বহুধাবিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি, তাঁর দুঃসাহসী বহুমুখী সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও বাস্তব কর্মকান্ডকে নেহাৎ কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না বলেই আমরা, বাঙালি ভদ্রলোকেরা তাঁর নামটি মনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। যদিও তাঁর একটি চিন্তাকেও আমরা আত্মিক অর্থে গ্রহণ করিনি।

আর অক্ষয়কুমারের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। বিজ্ঞান প্রচারক রূপে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক রূপে, দর্শনের নব ব্যাখ্যাকার ও ইতিহাসকার রূপে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষক রূপে, শিক্ষিত বাঙালি মানসে বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞানচেতনা জাগানোর মধ্যে তাঁর কর্মকান্ড সীমায়িত ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য অসুখে অক্রান্ত হয়ে প্রকাশ্য সমাজজীবন থেকে অবসর নেন তিনি। প্রথম জীবনে আর্থিকভাবেও তেমন সচ্ছল ছিলেন না। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও, আনুষ্ঠানিক কোনো তকমা ছিল না তাঁর, ছিল না সরকারী কোনো স্বীকৃতি। যেটুকু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তা পেয়েছিলেন ঐ বিদ্যাসাগর মশায়েরই কাছ থেকে, যিনি তাঁকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সসম্মানে (যদিও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ সময়েই তাঁর, সেই বিখ্যাত শিরঃপীড়া মারাত্মক আকার ধারণ করে। চাকরি তো ছেড়ে দেনই, বাকি জীবন দুর্বিষহভাবে কাটান সেই অসুখের প্রকোপে। তারও আগে, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিশীলতাকে নায্য গুরুত্ব দেওয়ার দরুন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়, ছাড়তে হয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক পদ। মস্তিষ্কচর্চা ছাড়া উপার্জনের আর কোনো পথ তাঁর জানা ছিল না। সেই পথ ধরেই সারা জীবন চলেছিলেন। প্রথম জীবনের আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠেছিলেন শুধু বই লিখে। দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যে অসীম ধৈর্যে, অকল্পনীয় পরিশ্রমে যে অমূল্য ফসল তিনি ফলিয়ে গেলেন তা থেকে পুষ্টি অর্জন করার কোনো দায় আমরা পরবর্তীকালে অনুভব করিনি। তারই পরিণতি আজকের এই বিস্মৃতি।

অক্ষয়কুমার দত্তের এই বিস্মৃতির কারণ সম্ভবত দুটি। প্রথমত, অক্ষয়কুমারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক খুঁটি ছিল না। তিনি সারা জীবনই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থেকে চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রেখে কাজ করতে চেয়েছিলেন ও পেরেছিলেন। তাতে তাঁর প্রবল বিরোধী স্বাতন্ত্র্য অটুট ছিল বটে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহ্যতা না থাকায় গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালির কাছে তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর ইস্কুল পাঠ্য বইগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল তাই শিক্ষিত বাঙালির কাছে তিনি অনেকদিন চারুপাঠ, ভূগোল আর পদার্থবিদ্যার পাঠ্যবই লেখক হিসাবে স্মরণীয় ছিলেন। যুগের পরিবর্তনে সেইসব পাঠ্যপুস্তক যখন আর অপরিহার্য রইল না, তখন অক্ষময় কুমার দত্তও আস্তে আস্তে চলে গেলেন বিস্মৃতির অন্তরালে। দ্বিতীয়ত, অক্ষয়কুমার দত্তর আবেদন ছিল বুদ্ধির কাছে আবেগের কাছে নয়। তাঁর গদ্যভঙ্গির ও বক্তব্য পেশ করার ধরনের মধ্যে যুক্তিশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। অতখানি যুক্তিনির্ভরতা সাধারণ, এমনকি অসাধারণ বাঙালিদের পক্ষে হজম করা বেশ কষ্টসাধ্য। তাই আজ অক্ষয়কুমারের যেটুকু পরিচিতি (যাঁরা আদৌ তাঁর খবর রাখেন তাদের কাছে) সেটা বাংলা মননশীল গদ্যের আদি পর্বের এক নিপুন রূপকার হিসেবে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্যব্যাখ্যায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদগাতা হিসেবে, আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান দর্শনের একজন স্থপতি হিসেবে, ভাষাতত্ত্বের আদি আলোচক হিসেবে বিজ্ঞানবিমুখতার ক্ষমাহীন বিরোধী হিসেবে, সেকিউলার মানবিকতার নির্ভীক প্রবক্তা হিসাবে তিনি আজ প্রায় অজ্ঞাত।

জগতের অপরিবর্তনীয় স্বাভাবিক নিয়মের কথা শুনলেই আজকের দিনে আমরা বিদ্রূপের হাসি হাসব। কিন্তু উনিশ শতকের বিশ তিরিশের দশকে ও কথাটা বলা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাঁর জন্য রীতিমতে সাহসের প্রয়োজন হত। তখনো ডারউইন তত্ত্ব অনাগত, যদিও লায়েলের ভূতত্ত্বের মধ্যে বিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমান ইতিমধ্যেই ফুটে উঠতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানচর্চার বেন্দ্রভূমিতে পণ্ডিতদের মধ্যে তা নিয়ে চলেছে তুমুল বিতর্ক। ধর্মতাত্ত্বিকরা তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, ধার্মিক বিজ্ঞানীরাও দ্বিধাগ্রস্ত। সেই অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক প্রান্তে বসে এক সদ্য কৈশোর উত্তীর্ন যুবকের পক্ষে জগতের ধর্মীয় অনুমোদন বিহীন অপরিবর্তনীয় স্বাভাবিক নিয়মের কথা বলা খুব স্বাভাবিক কাজ ছিল না।

তাই চুপীগ্রাম থেকে খিদিরপুর হয়ে প্রাক-ডারউইন যুগের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত কলকাতার দর্জিপাড়ায় পড়তে আসা এক কিশোর যদি মনে করে থাকে, একমাত্র বিজ্ঞানই মানুষের সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কিছু জ্ঞান সরবরাহ করতে পারে যা অপরিবর্তনীয় ও স্বাভাবিক, তাহলে সে সেযুগের ইউরোপের বিজয়ী বুর্জোয়াদের ভাবনারই সঙ্গী ছিল। বিজ্ঞানহীন, প্রায় মধ্যযুগীয় সেই ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে তার মনে ঐ সাহসী প্রত্যয়ের আবেদন কী করে এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল, তা ভাবলে অবাক লাগে। কারণ তখন এদেশে ইংরেজি শিক্ষিত মহলে এটা মোটেই স্বাভাবিক বা স্বীকৃত ভাবনা নয়। শিক্ষিত মহলে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ইংরেজি সভ্যতাকে বরণ করাই তো তখন রেওয়াজ। তাই বিজ্ঞানকে জড়িয়ে নিয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করার এই ব্যতিক্রমী সাধনা এক বিশেষ ধরনের গুনসম্পন্ন মনের পরিচায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৩৭ খ্রি: নাগাদ গোলাম মুরশিদ সেই সময়ে শিক্ষা বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'একটা বিষয় লক্ষ্যযোগ্যরূপে অনুপস্থিত ছিলো, সে হলো বিজ্ঞান। সেকালে বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়নি, সে কথা ঠিক কিন্তু বিলেতের স্কুলে অনেক আগে থেকে বিজ্ঞান পড়ানো হতো। ... কলকাতায় বিজ্ঞান পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কেন ইংরেজরা অনুভব করেননি, বোঝা মুশকিল। হয়তো কেবল কেরানি আর ডেপুটি তৈরি করাই ছিলো তাঁদের উদ্দেশ্য। এদের জন্য তাঁরা বিজ্ঞান পড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি।' (আশার ছলনে ভুলি, পৃ: ৩৫-৩৬)

কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনো পাইনি। কীসের তাড়নায় অক্ষয়কুমার দত্ত সেই যুগে বিজ্ঞানকেই তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসার মাধ্যম বলে মেনে নিলেন? ধর্মের পাল্টা কোনো বিশ্বাসের জমি খুঁজে নেওয়ার তাগিদই সম্ভবত তাঁকে বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরার দিকে প্রনোদিত করেছিল। ধর্মও তো এক ধরনের অপরিবর্তনীয় নিয়মই শেখায়, সে শিক্ষাটা যে ভুল, তা তিনি অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ধর্মের বদলে প্রকৃতির নিজের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহন করাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠল। ঠিক করলেন, জীবনধারনের জন্যও তিনি এমন সব কাজই করবেন যা প্রকৃতির নিজের কাছ থেকে শেখা ঐ স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের সঙ্গে যুক্ত। বিতরণের ব্যাপারটাও তাঁর কাছে অর্জনের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলেন, তিনি বিজ্ঞান নিয়ে লিখবেন বাংলায় যে বাংলা গদ্য তখনো এতটাই অপরিনত যে এমনকি যতিচিহ্ন গড়ে নিতে হয়েছিল। আদর্শ ও মনোগত প্রবনতার সঙ্গে আপস করে অর্থোপার্জনের পথে নামতে রাজি হলেন না অক্ষয়কুমার। 'তীব্র আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সমকালের জনপ্রিয় বৃত্তিগুলির (বনিকবৃত্তি, দালালবৃত্তি, কুশীদবৃত্তি, ব্যবহারবৃত্তি) কোনটিই গ্রহন করেন নি। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জানার জন্য তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেই সেই জ্ঞান সম্প্রসারিত করার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।'[১]

কথা হচ্ছে, এইসব পথের সন্ধান পেলেন কোথা থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত? প্রশ্ন ভেতর থেকে আসতে পারে কিন্তু পথ তো বাইরে থেকেই খুঁজে নিতে হয়। হার্ডম্যান জেফ্রয় গৌরমোহন আড্য স্কুলের কর্তৃপক্ষীয় ছিলেন। তিনি স্কুলগৃহে অবস্থান করতেন। অক্ষয়কুমার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় তাঁর নিকট কিছু গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা, অল্প ফরাসি ভাষাও অধ্যয়ন করতেন। হার্ডম্যানের কাছে পড়ে অক্ষয়কুমারের বিশেষ আগ্রহ জন্মায় গ্রীক ও ল্যাতিন সাহিত্যের প্রতি। এছাড়া বিজ্ঞান আর গণিতে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ তো ছিলই। ইস্কুলে একেবারে প্রাথমিক স্তরের যেমন বিজ্ঞানের বই পড়েছিলেন তার মধ্যে একটি হল জেরেমায়া জয়স-এর লেখা Diologues : Intended for the Instruction and Entertainment of young people (1807, re-print London : Scott and webster)। এটি ব্রিটেনে স্কুলপাঠ্যে জনপ্রিয় বই। তখনকার দিনে জার্মান না জানলে বিজ্ঞান চর্চা করা খুব কঠিন বলে তিনি জার্মান ভাষার চর্চা করেন। অপরদিকে ইলিয়াডের গোগকৃত ইংরেজি অনুবাদ এবং ভার্জিলের ঈনিড-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়েন। এরই পাশাপাশি জ্যোতিবিজ্ঞান আর ভূগোলের অধ্যয়ন থেকে তিনি এমন সব প্রাকৃতিক তথ্যের ও প্রক্রিয়ার সন্ধান পান যা শাস্ত্র বা পুরাণ বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মেলে না। না মিললে কোনটাকে বেছে নিতে হবে সে বিষয়ে সব দ্বিধা তাঁর কেটে গিয়েছিল। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম চার অধ্যায়, বুনিয়াদি বীজগণিত আয়ত্ত করেছিলেন। চুরি যাওয়া বই শোভাবাজার রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে ফেরত দেওয়ায় ঐ লাইব্রেরির দরজা খুলে যায় তাঁর সামনে। তিনি শ্রীনাথ ঘোষ (রাধাকান্ত দেবের জামাই) আর দৈহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু দুজনেই গণিতজ্ঞ ছিলেন এদের কাছে গণিত শিক্ষায় সহায়তা পেয়েছিলেন। এছাড়া অক্ষয়কুমার গণিতচর্চার সহায়ক হিসেবে অমৃতলাল মিত্রের নাম সকৃতজ্ঞ চিত্রে স্মরণ করেছেন। তিনি শোভাবাজার লাইব্রেরিতে এক বছরের মধ্যে পুরো ইউক্রিড শেষ করলেন, ত্রিকোণমিতি আর কনিক সেকশন আয়ও করলেন, রপ্ত করে নিলেন

ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস। এবার তিনি মজলেন পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক ভূগোলে। তিনি বেকনেও মজেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ট বিচার করার জন্য তিনি সংস্কৃতও শিখেছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিখতে লাগলেন কলকাতার মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং চুপীর বিখ্যাত অন্ধ পণ্ডিত গোপীনাথ ভট্টাচার্য। মোটের উপর অক্ষয়কুমার নিজের চিন্তার অনুযায়ী সিলেবাস নিজের মতো করে সাজিয়েছিলেন। কারণ তিনি প্রথাগত শিক্ষা বেশিদুর চালাতে পারেন নি। পিতৃবিয়োগের ফলে অকালে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়েছিল।

জীবিকা নির্বাহ ও অর্থোপার্জনের জন্য অক্ষয়কুমার যখন তৎপর হয়েছিলেন ঠিক সেই সময় তার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুরোধে কয়েকটি গদ্য অনুবাদ করেন এবং সেগুলি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহেই তিনি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হলে অক্ষয়কুমার দত্ত তাতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পাঠশালা পরে কলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হলে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতাকালে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্যাদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ আগস্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রি: পর্যন্ত মোট বারো বছর এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সহজেই এই পদ পান নি। রীতিমতো যোগ্যতা প্রমান দিয়ে এই পদপ্রাপ্ত হন। এই পদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষায়'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ'- এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ও আরো তাবর অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিশীল পরিবেশনায় একপ্রকার মুগ্ধ হয়ে প্রথম হয়েছিলেন এবং সম্পাদক পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ কেন্দ্রিক। আর অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বস্তুজিজ্ঞাসা, জীবন জিজ্ঞাসা ও সমাজ জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোড়িত। অক্ষয়কুমারের চেষ্টাতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তত্ত্ববোধিনী-র সাফল্য বহুলাংশে অক্ষয় কুমারেরই কৃতিত্বের ফল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল তাহা কেবল এক অক্ষয়কুমার দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।'[২]

বাংলা ভাষা ও শিক্ষাকে কূপমণ্ডুকতা এবং গ্রাম্য পান্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতার হাত থেকে উদ্ধার করে তার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অক্ষয়কুমার তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক রচনায় বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কুসংস্কার ইত্যাদির প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করার গুরুত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর অক্ষয়কুমার বড় রকমের গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ নিয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধেই আলোচনা করেছেন। "ভারতীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়" নামক রচনায় তিনি বলেন, "কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে ও তাহার সুনিপুন শিক্ষক সকল অনায়াস প্রাপ্ত হয়। অতএব এদেশীয় লোককে বাঙলার পরিবর্তে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। ... এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এইমাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্মভাষায় কি পর ভাষার জ্ঞান উপার্জন সুলভ হয়? এ বিষয়ে আমাদিগের কোনো সংশয় স্থলই বোধ হয় নাই। ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর এই গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও তিনি অন্য ভাষা শিক্ষার বিরোধী তো ছিলেনই না উপরন্তু অন্য ভাষা শিক্ষারও চর্চার ওপরও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা দান যাতে ঠিকমতো সম্ভব হয় এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাতে পাশ্চাত্য এবং দেশীয় অন্যান্য ভাষার গ্রন্থাদি বাংলায় লভ্য হয় তার জন্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে বলেছেন। আর অনুবাদের জন্য যে অন্য ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য একথা বলাই বাহুল্য। তিনি 'ভারতীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়' নামক রচনায় বলেছেন।

অক্ষয়কুমার ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চার ওপর যে গুরুত্ব আরোপ অক্ষয়কুমার ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি হিসেবে করতেন তা বর্তমান সময়েও দুর্লভ। তাঁর কথা হল 'ইহারা পরদেশীয় ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না।' এ বিষয়ে গভীর আবেগ ব্যক্ত করে তিনি বলেন—'গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি ইউরোগের সমস্ত দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থকর্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থরল ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যাগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাভ করে? এসিয়াটিক রিসার্চ ও এসিয়াটিক্ সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকান্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে? ('ভারতীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়')

অক্ষয়কুমার নিজের সময়ের শিক্ষিত লোকদের দেশীয় ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতার যে কথা এখানে বলেছেন তার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে এখনকার শিক্ষিত সমাজের দুর্গতি যে কি ভয়াবহ তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। কারণ আমাদের দেশের বর্তমান ছাত্র ও নব্য শিক্ষিত লোকজন যে শুধু নিজেদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না তাই নয়, এরা ইতিহাস বিষয়ে সাধারণভাবে অজ্ঞ। নিজের ও পরদেশের কোনো ইতিহাস এদের জানা নেই। শুধু তাই নয়, এটা জানার সামান্যতম কোনো প্রয়োজনবোধ এবং উৎসাহও এদের মধ্যে নেই। কাজেই ইতিহাস চর্চার কথা বলা ও স্কুল কলেজে সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা বর্তমান আমাদের অরণ্যে রোদনেরই শামিল। খুব সুনির্দিষ্ট কারণেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সুপরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বিজ্ঞানমনস্ক, মনুষ্যবোধসম্পন্ন, উদারনৈতিক ব্যক্তির মতামত কি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার অখন্ড ঐক্য ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সমাজসংস্কার বিষয়ক চিন্তা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় আকারে ব্যবহার করেছিলেন। অক্ষরাকুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে কি অসাধারণ যোগ্যতার সাথে সম্পাদনা করেছিলেন এটা তৎকালীন সংবাদপত্র, বিধবাবিবাহ আন্দোলনসহ নানা সমাজ সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ের ইতিহাসের সাথে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন। তিনিও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই পত্রিকার মাধ্যমে যে শুধু বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁরা তৎকালীন বঙ্গদেশে মননশীল চর্চাকেও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনেক প্রবন্ধেই অক্ষয়কুমার স্ত্রী শিক্ষার ওপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারী, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কিজন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোনো কারন প্রত্যক্ষ হয় না।' আবার 'পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞানজনক রত্নে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপা মনোমধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহিত হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান।' স্ত্রীশিক্ষায় অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে বিষয়টিকে উৎসাহিত করেন এটা থেকে বোঝা যায় সামাজিক উন্নতি ও সমাজকে সুসভ্য করার ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার ওপর তিনি কতখানি গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি বলেন, 'রমণীগণের জ্ঞানবিষয়ে দেশের কি অসংখ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে, দুষ্কর্ম, কুব্যবহার এবং নিলজ্জতা দিনদিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সভা, পাঠশালায় প্রকাশ্য পত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের সুখ, সভ্যতা, সৎকর্ম ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছি কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি অযত্ন সত্বেও সে অভিপ্রায় কলাপি সুসম্পাদ্য নহে। যদিও কখন এদেশীয় সমুদায় পুরুষ বিদ্বান এবং পুণ্যশীল হয়েন (যাহা অতি দুঃসাধ্য তথাগি ভারতবর্ষের সদবস্থার সম্ভাবনা নাই।'

'স্বপ্নদর্শন' নামে অক্ষয়কুমার চারটি রচনা প্রকাশ করেন, যা ছিল গুরুতর বিষয়ের আলোচনার এক অভিনব প্রয়াস। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বপ্নদর্শন 'বিদ্যা বিষয়ক', 'ন্যায় বিষয়ক', 'কীর্তি বিষয়ক' ও 'মনুষ্যচরিত বিষয়ক' এই রচনাগুলিতে স্বপ্নের

আচ্ছন্নতায় তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করছেন তারই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিদ্যা, ন্যায়, কীর্তি ও মনুষ্যচরিত বিষয়ে তিনি তাঁর চিন্তাকে রম্যরচনার ফর্ম-এ উপস্থিত করেছেন।

অক্ষয়কুমার প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বক্তব্য এই- "অক্ষয়কুমারই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান চর্চায় ও গবেষণায় কিছু মন দিয়েছিলেন। ...অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর ঋজু ও পরিমিত বাক্রীতি সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপজাত। তাঁর রচনারীতিতে লাবন্য নাই কিন্তু দৃঢ়তা, ঋজুতা ও ব্যবহারযোগ্যতা আছে। বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত ভাষা অক্ষয়কুমারই বাংলায় প্রথম দেখিয়েছেন।"[৩] ১৮৫৬ সালে লেখা 'পদার্থবিদ্যা' বই থেকে উদ্ধৃত অংশ দেখলে অনুধাবন হয়।

যে গুণ থাকাতে, এক দ্রব্য দূর হইতে অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহার নাম মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের ফল, মেঘের জল, ছাদের ইষ্টক ইত্যাদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে পতিত হয়। ...

যদি পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে বাষ্প ও ধূম ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয় কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য বটে। আকর্ষণই উহার কারণ। যেমন, সোলা তৈল জল অপেক্ষা লঘু এ নিমিত্ত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া ওঠে, সেরূপ বাশ ও ধূম পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ নিমিত্ত বায়ুর মধ্যে দিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বাষ্প ও ধূমকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বায়ু বাষ্পাদি অপেক্ষা ভারী, এ প্রযুক্ত (এই হেতু) আপনি অধঃপতিত হইয়া বাষ্পাদিকে উৎক্ষিপ্ত করে। ইহাতেই বাষ্প ও ধূম ঊর্ধ্বগামী হয় এবং উঠিতে উঠতে, যে স্থানে বায়ুর ভার ঐ বাষ্প ও ধূমের সমান, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে। (পৃ. ২১)

যুক্তিগ্রাহ্যতায়, প্রাঞ্জলতায়, যথাযথ ও প্রসাদগুণে এ গদ্য ভালো আধুনিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনীয়। জটিল বৈজ্ঞানিক বক্তব্য অনায়াসে স্বাভাবিক বাংলা অন্বয়ের মধ্যে দিয়ে কীভাবে প্রকাশ করা যায়। এই বাক্যগুলি তার চমৎকার উদাহরণ পাঠককে যেন হাতে করে জটিল গ্রন্থিগুলি পার করিয়ে দিয়েছে।

ঠিক কোন বয়সে অক্ষয়কুমার ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালেন তা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমত আর সেই সম্প্রদায়ের ধারণামতো সৃষ্টিকর্তায় তাঁর বোধ হয় কোনোদিনই আস্থা ছিল না।[৪] অজিতকুমার চক্রবর্তী অনুমান করেছেন, অক্ষয়কুমার 'ব্রাহ্মধর্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক 'ডীজম' করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।'[৫] কথাটি ঠিক বলেই মনে হয়। ষোলো শতকের শেষ ও সতেরো শতকের গোড়ায় ইউরোপে এই ডীজম অর্থাৎ ঈশ্বরবাদ এর জন্ম হয়। এই মত অনুযায়ী, ঈশ্বরকে স্বীকার করা হলেও কোনো প্রচলিত ধর্মমত, প্রার্থনা, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদি সবই বাতিল হয়ে যায়। দীপায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) যুগের প্রধান ফরাসি চিন্তাবিদ, দেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪ খ্রিঃ) একবার বলেছিলেন, ডীইস্ট তিনিই যিনি নিরীশ্বরবাদী হওয়ার মতো বেশিদিন বাঁচেননি।[৬]

অক্ষয়কুমার অবশ্য যে ডীইস্ট ই থেকে গিয়েছিলেন এমন নয়। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের এক বক্তৃতায় তিনি একবার বলেছিলেন- "ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র, গৌতম ও কনাদ এবং বেকন ও কোঁত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র।"[৭] এদের মধ্যে লাপ্লাস ও কোঁত দুজনেই ছিলেন মার্কামারা নিরীশ্বরবাদী। তাই অক্ষয়কুমারের বক্তৃতাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপার সময়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কো-মাতব্বর নাম দুটি বাদ দিয়ে দেন। অক্ষয়কুমার তাতে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকগুলি সম্বন্ধে সচেতনভাবেই কম কথা বলতেন। সেগুলোকে রেখে দিতেন নেপথ্যে। মানুষের সঙ্গে ঐহিক বাহ্যজগতের সম্বন্ধ কী, সেটাই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য। পরম সত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী, তা নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। তিনি বাহ্য জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ততটুকুই আগ্রহী ছিলেন, যতটুকু সেই পরম সত্তার উপাসনায় সহায়ক। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন একবার — "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ—আকাশ পাতাল প্রভেদ।"[৮]

খানিকটা স্পিনোজার ধরনে অক্ষয়কুমার প্রকৃতি আর প্রকৃতির ঈশ্বরের ধারনাটি গড়ে তোলেন। ঈশ্বর মানে হল, প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলার অমোঘত্ব। তিনি স্পষ্ট ভাষায় একথাও বলেন যে ভারতীয় মনীষা যে বৈজ্ঞানিক ভাবনার ক্ষেত্রে ঈপ্সিত প্রগতি ঘটাতে পারেনি তার একটি বড় কারণ হল অনৈহিকতার প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ । এই বিশ্বজগৎ কোন কোন কারনে অবাস্তব তার প্রমান তার প্রমাণ সন্ধানেই কী করলে এই জঘন্য মনুষ্যজন্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় সন্ধানেই তাদের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়েছে।

বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি হিসেবে বেদকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি তিনি সেখানে স্থাপন করতে পারলেন না। বেদান্তের ভিত্তিকে নড়িয়ে দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে নিরন্তর তর্কবিতর্ক করতে থাকেন। অনেক তর্ক ও বিচারের পর অক্ষয়কুমারের যুক্তির কাছে দেবেন্দ্রনাথ এই মত মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ এই মত মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না, আমাদের ধর্ম্ম পোষণের জন্য তাহা গ্রহন করিতে পারিলাম না।" অপরদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী অক্ষয়কুমারের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগন বেদের অভ্রান্তকে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্তবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"[৯]

তখন দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদে আশ্রয় খোঁজেন। তিনি ১১টি উপনিষদের কথা জানতেন যেগুলি শঙ্করাচার্য ভাষ্য করেছিলেন। উপনিষদ অন্বেষণ করতে গিয়ে আরও উপনিষদের খোঁজ পেলেন এবং ১৪৭ টি উপনিষদের কথা জানলেন। বহু সংখ্যক উপনিষদ থাকলেও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকৃত উপনিষদগুলিই হলো প্রামান্য। তার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি ধরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হতে থাকলো। কিন্তু সেখানেও দেখলেন 'সোহহমস্মি' তিনিই আমি, 'তত্ত্বমসি' তিনিই তুমি তখন সেই উপনিষদের উপরেও তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। ফলে উপনিষদের ভিত্তিভূমি তাঁর কাছে হয়ে উঠল 'বালুকাময় এবং শিথিল' কোনো মাটি পেলেন না। তখন তিনি আশ্রয় করলেন হৃদয়কে। 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই হলো ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।[১০]

শুধুমাত্র বেদের অভ্রান্ততায় অক্ষয় দেবেন্দ্র মতবিরোধ সীমিত ছিল না। দুর্বল মতি, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি সহযোগে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করবেন দেবেন্দ্রনাথ এই মত স্থির করে প্রচার করতে উদ্যত হন। কাঁচড়াপাড়ার জগচ্চন্দ্র রায় ও লোকনাথ রায়ের পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মমন্ত্র দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। ঘোরতর তর্কযুদ্ধে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথকে এই মত প্রচার করতে বিরত করেন।[১১] ছাত্রদের সামনে তিনি প্রার্থনার অসারতা আন্তিক সূত্রে ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি দেখান একজন কৃষক পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। পরিশ্রমের সঙ্গে সে প্রার্থনা করলেও ফসল উৎপন্ন হয়। এখন প্রার্থনার ফল হয় শূন্য।

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

প্রার্থনা = ০

মেডিকেল কলেজের নীলমাধববাবু যখন এই শূন্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন, তখন অক্ষয় কুমার বলেছিলেন, 'বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধ সুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নূতন বোধ হইল, এটি বড় দুঃখের বিষয়।' ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে কোনো সাধারণ বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার প্রস্তাব উঠলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। ফলে প্রার্থনা বন্ধ হয়।[১২]

কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কাজের কিছু অংশ বহুকাল ধরে সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হতো। অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তা বোঝা খুব একটা সুবিধের ছিল না। এই বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় বললে তার মর্মোদঘাটন করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সহজসাধ্য হতো এটা অক্ষয়কুমার মনে করতেন। কিন্তু এই রীতির পরিবর্তনে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যন্যদের মত ছিল না। পরে রাখালদাস হালদার ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে খিদিরপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলে সেখানে বাংলা ভাষাতেই উপাসনা সম্পন্ন হয়। অক্ষয়কুমার ও অন্যান্য কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আসেন।[১৩] ১৮৫২ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হলে যার উদ্যোক্তা ছিলেন অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেননি। মনের বিরূপতা নিয়ে বলেছেন, 'কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মতো সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।'[১৪] ১৮৫৪ সালের মার্চে রাজনারায়ন বসুকে চিঠিতে লিখেও ফেলেন, কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।' (পত্র সংখ্যা ১০)[১৫] এই নাস্তিকদের দলে যে অক্ষয়কুমারও ছিলেন এটা বুঝাতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এর পরের বছরেই তত্ত্ববোধিনী-র সম্পাদনা থেকে অক্ষয়কুমার সরে যাচ্ছেন।

তখন বিদ্যাসাগর মশাই অক্ষয়কুমারকে সদ্যোস্থাপিত শিক্ষক-শিক্ষণ ('নর্মাল') স্কুলের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। নিয়োগকালে তিনি বলেছিলেন বাংলা ভাষায় এর চেয়ে কুশল গদ্যকার ও নানা বিষয়ে এত জ্ঞানী ব্যক্তি এখন আর কেউ নেই। কিন্তু আগস্ট ১৮৫৮-য় প্রবল শিরঃপীড়া-র দরুন তিনি সে কাজ ছেড়ে দেন। এই অসুখ তাঁর সারা জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। 'তখন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পুস্তকাবলীর আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বৃত্তিগ্রহন বন্ধ করেন।'[১৬]

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তাঁর সেই জীবনব্যাপী সাধনার মহত্তম ফসল। বইটির তথ্য প্রধান অংশের অনেকটা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হলেও বেশির ভাগটাই, বিশেষ করে উপক্রমনিকা অংশের সবটাই উত্তর তত্ত্ববোধিনী পর্বে রচিত। সেটাই স্বাভাবিক। উপক্রমনিকাতে খোলাখুলি ভাববাদ-বিরোধী এবং বেকনীয় এম্পিরিসিস্ট মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে; প্রমান করা হয়েছে যে ভারতীয় দর্শনচিন্তার অধিকাংশই আসলে অনীশ্বরবাদী ভাবনায় পরিপূর্ণ, দেখানো হয়েছে যে অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ভাবনার জন্ম দেওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়রা আরোহবাদী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্রের জন্ম দিতে পারেনি এবং সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হল ভারতে নয়, ইউরোপে বেকন, দেকার্ত, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটনের হাত। একটা ব্যাপার বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মৌলিক বিরোধিতার ধারনাটা অক্ষয়কুমার দত্ত অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। ধর্ম বিযুক্ত ও বিজ্ঞাননির্ভর মানবিকতার প্রবক্তা ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল - এই তিনজনকে একত্রে আধুনিক বাংলার বিজ্ঞানভাবনার প্রবর্তক ত্রয়ী বলা যেতে পারে। তবে একথা ঠিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র শেষ পর্যন্ত সামাজিক রাজনৈতিক রক্ষনশীলতার পক্ষে চলে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও তীব্র অভিমানে ভদ্রলোক বাঙালিদের সংস্রব ত্যাগ করেন। অক্ষয়কুমার কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের মতো করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন—আর্থিক অসচ্ছলতা, অমানুষিক শিরঃপীড়া, কোনো কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

ওপরের তথ্যগুলির সারসংক্ষেপ করলে আমরা বলতে পারি, সরকারি বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে লোক ছিলেন না অক্ষয়কুমার দত্ত। তার ওপর কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তকমা ছিল না তাঁর। তাঁর যা কিছু অর্জন, সবই ব্যক্তিগত প্রয়াসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রই ছিল তাঁর স্বভাবের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমের মধ্যেও ব্যতিক্রম। তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম ও ভাবনাচিন্তাই এত বেশি স্বাতন্ত্র্য দ্বারা চিহ্নিত; যুক্তি, তথ্য ও বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে এমনই ওতপ্রোত যে বাঙালি মননের মূলস্রোত তাঁর তেজ ধারণে অক্ষম হয়। তাই অকৃতজ্ঞ, অবিদ্যা-বিলাসী আমরা আজ তাঁকে সরিয়ে দিয়েছি আমাদের চেতনাসরনি থেকে।

বিংশ শতাব্দী পার করে দেওয়ার পর, অনেক অবিশ্বাস্য উত্থানপতন দেখার পর, 'মুক্তিদাতা' বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়েই অনেক সন্দেহ ও সংশয়ে দংশিত হবার পর, আজ মনে হয় অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মানুষকেই আমাদের অন্তরের সঙ্গী করে নেওয়ার

প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি। এজন্য নয় যে তিনি সবকিছু ঠিকঠাক বুঝেছিলেন বা তাঁর দিগদর্শন বিনা সমালোচনায় গ্রহনের যোগ্য। একেবারেই না, কিন্তু তিনি যে ভুল করেছেন এবং ভুল শোধরাতে শোধরাতে এগিয়েছেন, এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। যে সাহসের সঙ্গে তিনি মূলস্রোতের বিরোধিতা করে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে অনুসন্ধানবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সেই মুক্তমন সাহসিকতার জন্যই আর তিনি আমাদের কাছে নতুন করে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। আপ্তবাক্যের পায়ে চিন্তাহীন আত্মসমর্পন নয়—'সুনির্মল' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শাসিত বাস্তবমুখী জীবনচর্যায় উদ্বুদ্ধ করাই অক্ষয় কুমার দত্তের সবচেয়ে বড়ো অবদান।

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত বইয়ের তালিকা :

	বইয়ের নাম	**প্রকাশকাল**
১।	অনঙ্গমোহন	১৮৩৪ খ্রি:
২।	ভূগোল	১৮৪১ খ্রি:
৩।	বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচা, প্রথম ভাগ	১৮৫১ খ্রি:
৪।	বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, দ্বিতীয় ভাগ	১৮৫৩ খ্রি:
৫।	চারুপাঠ, প্রথম ভাগ	১৮৫৩ খ্রি:
৬।	চারুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ	১৮৫৪ খ্রি:
৭।	বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ	১৮৫৫ খ্রি:
৮।	ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব	১৮৫৫ খ্রি:
৯।	ধর্ম্মনীতি	১৮৫৬ খ্রি:
১০।	পদার্থবিদ্যা	১৮৫৬ খ্রি:
১১।	চারুপাঠ, তৃতীয়ভাগ	১৮৫৯ খ্রি:
১২।	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম খণ্ড	১৮৭০ খ্রি:
১৩।	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় খণ্ড	১৮৮৩ খ্রি:
১৪।	প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বানিজ্যবিস্তার	১৯০১ খ্রি:

(সূত্র : আশীষ লাহিড়ী : অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক, পৃ: ৮২-৮৫)

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার :

১। শামলী সুর, ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ১১

২। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃ: ২১

৩। সুকুমার সেন, বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৭

৪। রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, 'বাবু (অক্ষয়কুমার) অনেককাল আগেই ব্রাহ্মধর্মে আস্থা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি হয়ে ওঠেন অজ্ঞেয়বাদী(Agnostic)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, খণ্ড-১২, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৮) পৃ. ৩০

৫। অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৬)। সতীশচন্দ্র চক্রবতী, সম্পা., দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ৪১২

৬। সাইমন ব্ল্যাকবার্ন (এড.) অক্সফোর্ড ডিক্সাি শনারি অফ ফিলোসফি, অক্সফোর্ড ও নিউইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, পৃ: ৯৭

৭। আত্মজীবনী : মহেন্দ্রনাথরায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, কলকাতা, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৯৫ টী.

৮। অরবিন্দ মিত্র ও অসীম আমেদ (সম্পা.), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সাধারন ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ: ৪৭ (দ্বিতীয় অংশ)

৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ২০০৯, পৃ: ১৩১-১৩২

১০। দেবেন্দ্রনাথ, ঠাকুর আত্মজীবনী পৃ: ১২৩-১২৪

১১। মহেন্দ্রনাথ রায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, কলকাতা ১২৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৯০-৯১

১২। মহেন্দ্রনাথ রায় : ঐ পৃ: ৯১-৯৪

১৩। ঐ, পৃ: ১০৬-১০৭

১৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ: ১৭১

১৫। দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পত্র সংখ্যা ১০, পৃ: ১১

১৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ: ১

সহায়ক গ্রন্থ :

১। আশীষ লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করন : জুলাই ২০১৯

২। কোরক : বিষয়-বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার-সম্পাদক তাপস ভৌমিক (শারদীয় ২০২০)

৩। মুহম্মাদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত), বিজ্ঞান বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করন : জানুয়ারি ২০০৬

Citation: **কুণ্ডু. পি.**, (2025) "অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও মননদর্শন : একবিংশ শতকের আলোকে", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.